৪. বাংলা সাহিত্যের বিকাশে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান:

গীর্জা ও পাঠশালার বাইরে এনে বিচার বিশ্লেষণে উচ্চতর চিন্তার বাহন হিসাবে প্রথম ব্যবহারে লাগিয়ে বাংলা গদ্যকে যিনি জাতে তুলেছিলেন তিনি হলেন আধুনিক কালের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মনীষী রাজা রামমোহন রায়। তাঁর কর্ম ও চিন্তা, উদ্যম ও বিচক্ষণতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আধুনিক যুগের দরজা খুলে দিয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি এই আধুনিকতার অগ্রদূত।

উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ভাবধারা বিজ্ঞানের সংস্পর্শে যে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল তার নায়ক ছিল রাজা রামমোহন রায়। বাঙালি জাতিকে মধ্যযুগের গুটি কেটে আধুনিক যুগের মহাকাশে উড়তে শিখিয়েছিলেন তিনি। ইতালীয় রেনেসাঁসের জনক যেমন পেত্রার্ক তেমনি ভারতীয় রেনেসাঁসের জনক রাজা রামমোহন রায়। তাঁর কলকাতা আগমন এবং ১৮১৫ খ্রি: 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্ত সার' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই নবজাগরণের উল্লাস অনুভূত হলো। তাঁর দীক্ষায় বাঙালি যেমন তাঁর স্বকীয়তাকে অনুভব করল, অন্যদিকে তেমনি ধর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারলো, অন্যদিকে তেমনি সমকালীন ইউরোপীয় জীবনদর্শন উপলব্ধি করে নবজীবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো। ১৮১৫ খ্রি: থেকে ১৮৩৩ খ্রি: তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কালসীমাকে 'রামমোহন পর্ব' নামে অভিহিত করা যায়। এই কারণে মানবতাবাদী এই জাতীয় মহাপ্রাণকে 'বাংলা নবজাগরণের শুকতারা' বলা হয়।

রামমোহনের বাংলা গদ্য ও পুস্তিকার সংখ্যা প্রায় ত্রিশ। ইংরেজি গ্রন্থের সংখ্যাও তদনুরূপ। তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন—

Scanned with CamScanner

"উনবিংশ শতাব্দীতে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যের ব্যবহার করেন সর্বপ্রথম রামমোহন।" তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান-

১। বেদান্ত গ্রন্থ — ১৮১৫
২। বেদান্ত সার — ১৮১৫
৩। উপনিষদের অনুবাদ ১৮১৫-১৯
৪। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার - ১৮১৬-১৭
৫। ভট্টাচার্যের সহিত বিচার - ১৮১৭
৬। গোস্বামীর সহিত বিচার - ১৮১৮
৭। কবিতাকারের সহিত বিচার - ১৮২০
৮। সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক-নিবর্তক দ্বিতীয় সম্বাদ- ১৮১৯
৯। ব্রাহ্মণ সেবধি - ১৮২১
১০। পথ্য প্রদান - ১৮২৩
১১। গৌড়ীয় ব্যাকরণ - ১৮৩৩
১২। ব্রহ্ম সঙ্গীত - ১৮২৮

রামমোহনের সবচেয়ে আলোড়নকারী গ্রন্থ হলো- 'বেদান্ত সার'। খ্রিষ্টধর্মের বিরোধিতা করে বেদান্ত আশ্রিত একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের ভূমিকায় বাংলা গদ্যরচনার একটি বৈজ্ঞানিক নির্দেশ তিনি দিয়েছেন এইভাবে -

"বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুই-এর বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন, যাহা, যেমন, ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন, তাহা ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন, যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত অঙ্গীকার করিয়া অর্থ পাইবার চেষ্টা পাইবেন।"

রামমোহন বাংলাদেশে উপনিষদ চর্চা আরম্ভ করেন। ড্রাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর ভাগবত গীতা পদ্যানুবাদকে খুবই প্রশংসা করেছিলেন। ১৮২২ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে তিনি কোলকাতাতে 'মীরাত উল আখবর' নামে একটি ফারসী পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮২১ খ্রিঃ তিনি প্রকাশ করেন 'ব্রাহ্মণ সেবধি'। রামমোহন ভবানীচরণের সহযোগিতায় প্রকাশ করেন সম্বাদ কৌমুদী। এই পত্রিকা ছিল তাঁর গদ্য চর্চার মুখ্য অবলম্বন।

□ রামমোহনের কৃতিত্ব :

(i) রামমোহন সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে অনুবাদ আলোচনা, বিতর্ক ও মীমাংসার বাহন হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। তিনিই প্রথম যুক্তি, তর্ক, চিন্তা প্রভৃতি উপকরণে সজ্জিত করে বাংলা গদ্যকে আধুনিক চিন্তাশীল মনের যথার্থ বাহন হিসাবে ধরেছিলেন।

(ii) তাঁর গদ্য ছিল এককথায় ঋজু গতি সম্পন্ন ও তীক্ষ্ণ যুক্তি পরম্পরায় গ্রথিত। আসলে যুদ্ধের পোশাক ও বিবাহের পোশাক যেমন এক রকম হয় না, তেমনি তর্ক যুদ্ধের বাহন হিসাবে যে যুক্তি বহুল বাংলা গদ্যের ব্যবহার করেছেন তা লোলিত মধুর, পারিপাটি না হওয়াই স্বাভাবিক। যুদ্ধের প্রয়োজনে তিনি 'অসি' ছেড়ে বাঁশি বাজাতে চাননি।

[redacted]

(iii) বাংলা গদ্যকে তিনি সংগ্রামী চেতনার দৃঢ় ভিত্তির উপর [redacted] প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন —

"রামমোহন বাংলা গদ্যকে গ্রানাইট প্রস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"

(iv) কীভাবে বাংলা গদ্য পড়তে হয় তা যেন তিনি বাঙালি জাতিকে হাত ধরে শিখিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থখানি স্মরণীয়।

Scanned with CamScanner

(v) আধুনিক 'সাহিত্য গ্রন্থে' রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্পর্কে বলেছেন —

"কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই।"

(vi) পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যের পথ তিনি উন্মুক্ত করেন। আর সেই সব আবিষ্কারের পথে তাঁর পা অনেক অনেক জড়িয়ে গেলেও তাঁর গতি রুদ্ধ হয়নি।

(vii) ঈশ্বর গুপ্ত লেখক হিসাবে তাঁকে মান্য করতেন। তাই ১৮৫৪ র ৩০ই মার্চ 'সংবাদ প্রভাকর' এ তিনি লিখেছেন-

"দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন।"

(viii) রামমোহনের ভাষা কর্মী পুরুষের ভাষা, আদালতের উকিলের বা বিচার কক্ষে তার্কিকের ভাষা, ও ভাবুকের ভাষা নয়, শিল্পী রসিকের ভাষা নয়। তাই প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন -

"সে ভাষা জলবৎ তরল হয়েছে।"

(ix) রামমোহন ভাষার সৌষ্ঠবের দিকে দৃষ্টিপাত না করে তিনি প্রধানত বাক্যের সরল ও বোধগম্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন।

(x) তাঁর গদ্যে অনেক সময় কর্তা ও ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের প্রলম্বিত গঠন রীতির জন্য সম্পর্ক সূত্র ছিন্ন শিথিল হয়ে পড়েছে।

রামমোহন ছিলেন বাংলা গদ্যের সার্থক শিল্পী। তিনি প্রথম বাংলা গদ্যের শিথিল ও কোমল মাংস পিণ্ডের মধ্যে

যুক্তি ও তর্কের দ্বারা তাকে স্থাপন করেন। ফলে বাংলা গদ্য শৈশবের সরলতা ও কোমলতা অতিক্রম করে দৃঢ়তা ও শক্তি সঞ্চয়ে সক্ষম হয়। তাই তাঁর গদ্য যুক্তি-নিষ্ঠ হলেও তার সরলতা আমাদের মুগ্ধ করে। যেমন-

> "স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্প বুদ্ধি কহেন?.... ... আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?"

এই ভাষাভঙ্গি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক। রামমোহনের ভাষা যুক্তির ভাষা, বুদ্ধির ভাষা, বিচার বিতর্কের ভাষা, মননশীলতার ভাষা। বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ধারায় এই-খানেই নিহিত আছে রামমোহনের কৃতিত্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

— ০ —

দূরভাষ - 8640932050
- 8013024743

প্র. বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান:

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য ইংরেজ ও বাঙালি মনীষীদের সহযোগিতা। ১৮০০ খ্রি: ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এদেশের রীতি-নীতি এবং ভাষা সম্পর্কে শিক্ষাদান। এ কাজ শুধু একজনের ইংরেজ বা বাঙালি কারও পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। বস্তুত প্রয়োজনেই দুই সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞ এবং যোগ্য ব্যক্তিদের এখানে আহ্বান জানানো হয়েছিল। শ্রীরামপুরে কেরীর সকল কর্মপ্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল ধর্মপ্রচারের সীমার মধ্যে। নবগঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এসে তিনি বাংলা ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন এবং অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আপন প্রতিভার শক্তি প্রয়োগের সুযোগ পান। যেহেতু তখনো পর্যন্ত একটিও উল্লেখযোগ্য গদ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি, সেই সম্পূর্ণ অনাদৃত বাংলা গদ্যকে সর্ববিধ প্রয়োজনের ভাষা রূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করলেন। ফলে তিনি বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনা এবং অধ্যাপনার জন্য আটজন শিক্ষক নিয়োগ করেন। রামরাম বসুকেও তিনি এখানে নিয়ে এলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গুলি হলো —

১/ উইলিয়াম কেরী
- কথোপকথন (১৮০১)
- ইতিহাসমালা (১৮১২)

২/ রামরাম বসু
- রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১)
- লিপিমালা (১৮০২)

৩/ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
- বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)
- রাজাবলি (১৮০৮)
- হিতোপদেশ (১৮০৮)
- প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩) / রচনাকাল ১৮১৩

Scanned with CamScanner

৪/ তারিণীচরণ মিত্র — ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩)

৫/ গোলক নাথ শর্মা — হিতোপদেশ (১৮০২)

৬/ চণ্ডীচরণ মুন্সী — তোতা ইতিহাস (১৮০৫)

৭/ হরপ্রসাদ রায় — পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫)

৮/ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় — মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)

৯/ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন — পদার্থ কৌমুদী (১৮২১)
— আত্মতত্ত্ব কৌমুদী (১৮২২)

□ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য :-

গ্রন্থ গুলির প্রকাশ কালের প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় এই লেখক বৃন্দ নিরবিচ্ছিন্নভাবে গদ্যের অনুশীলনে রত ছিলেন। তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। বাংলা গদ্যের কোনো আদর্শ এদের সম্মুখে ছিল না, সুতরাং সংস্কৃত ভাষার রচনা শৈলীই তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন। কেরী 'কথোপকথন' এবং রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' কথ্যরীতি অনুসরণে লেখা, কিন্তু এর ভাষাকে আদর্শ ভাষা বলা চলে না। ফলে সংস্কৃত নির্ভরতাই যে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির উপায় এ বিষয়ে কেরী নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু ভাষার গতি সঞ্চার ও সহজ বোধ্যতার জন্য লোক প্রচলিত ভাষার উপকরণ ব্যবহার আবশ্যক। কেরীর 'কথোপকথন' প্রসঙ্গে গোপাল হালদার বলেছেন-

"এদিক থেকে কেরী আলালের, দীনবন্ধু প্রভৃতি খাঁটি বাঙালি লেখকদের পথপ্রদর্শক।... 'পণ্ডিতী ভাষা' নয়, 'আলালী ভাষা' গদ্যে কেন গ্রাহ্য হবে? কেরী নিজেই অনাবশ্যক সংস্কৃত পদ বর্জন করেছিলেন।"

সংস্কৃত-নির্ভর বাংলা গদ্যের সঙ্গে প্রচলিত কথ্যভাষার সামঞ্জস্য করতে গিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক বৃন্দ দুই রীতির গদ্য ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কোনো সামঞ্জস্য সূত্র উদ্ভাবন করতে পারেননি। তথাপি তাঁদের রচনায় বাংলা ভাষার মূল সমস্যা গুলি অধিকভাবে ধরা পড়েছিল এবং গদ্যের একটি নির্ভর-কাঠামো তাঁরা প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং কেরীর 'কথোপকথন' ভিন্ন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যান্য গ্রন্থগুলি মূলত অনুবাদমূলক, সংস্কৃত, আরবি-ফারসি এবং ইংরেজি হতে বিষয়বস্তু গৃহীত।

Scanned with CamScanner

□ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর অবদান:-

(ক) কেরী: উইলিয়াম কেরীর সংকলিত ও সম্পাদিত কথোপকথনে কথ্যভাষার কিছু কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলালে' সাধুভাষার কাঠামোয় কথ্যভাষার যে পরীক্ষা করে- ছিলেন 'কথোপকথনে' তার প্রাথমিক রূপ লক্ষ্য করা যায়। 'ইতিহাসমালার' গল্পগুলিতে সংকলিত হলেও এই গল্পের অধিকাংশই দেশীয় লেখকদের দ্বারা লিখিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। বাংলা ও ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে 'ইতিহাসমালা' প্রথম গল্প গ্রন্থ। সাহিত্যের মহিমা না হলেও যে লোককথাগুলিতে বাংলা গদ্য উনিশ শতকের আগেই যে কতটা সরল ও শক্তিশালী হয়েছিল 'ইতিহাসমালা'র অনেক জায়গায় তার উদাহরণ মেলে।

(খ) রামরাম বসু: রামরাম বসুর ভাষায় কোথাও কোথাও আড়ষ্টতা ও আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্য থাকলেও তাঁর কথকতার ভঙ্গীতে রচনাশৈলীর সরলতা ও সুসামঞ্জস্য এবং লোকপ্রচলিত বাক্য, পদ ও ইডিয়মের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

(গ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার: মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার শুধু কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যেই নয়, তৎকালীন বাংলা দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে শীর্ষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তিনি একদিকে যেমন গদ্যভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে অগ্রসর হয়ে ভাষাকে শক্তিশালী করে তুলে- ছিলেন, তেমনই বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনের দ্বারা

Scanned with CamScanner

সেই গদ্যের প্রথম শক্তির পরীক্ষা করেছেন। তিনিই একমাত্র লেখক যিনি বিষয় দ্বারা অভিভূত না হয়ে বরং নানা বিষয়ের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করবার শক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর গদ্য ভাষার মধ্যেও — বিষয় উপযোগী প্রয়োগ কুশলতা ও তাঁর কাব্য ক্ষেত্রে নতুন পথে পদক্ষেপ ও নব পরীক্ষার সার্থকতা দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন —

"মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি সচেতন শিল্পীমন ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ লইয়া গদ্য নির্মিতির ক্ষেত্রে রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বৈচিত্র্যহীন, অপাংক্তেয় বাংলার গদ্যের মধ্যেও কিছু সৌষ্ঠব, রুচিবোধ ও ছন্দ-স্পন্দনের প্রথম ক্ষীণ আভাস প্রবর্তন করিয়াছেন।"

পরিশেষে বলা যায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যবই মূলত এখানকার কলেজের ছাত্রদের জন্য। এগুলি বাইরের জনসমাজের সঙ্গে এর বিশেষ কিছু যোগ ছিল না। সামাজিক পরিবেশের প্রভাবের সংস্পর্শেই সাহিত্যকর্মীদের মনন-চিন্তনে সচলতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য আসে। বৃহত্তর সমাজ পরিমণ্ডলের সঙ্গে এঁরা ছিল সম্পর্কহীন। তাঁদের মৌলিক চিন্তাভাবনার কোনো উদ্দীপনা ছিল না, প্রধানত অনুবাদমূলক রচনায় মগ্ন ছিল। তবুও বলা যায় বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজই পরবর্তী কালের বাঙালি লেখকদের রচনার পথ প্রশস্ত করেছিল।

Q: বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদান :

আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রথম সার্থক শিল্পী বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্য সাহিত্য যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিদেশীদের চর্চায় কোনো রকম দুর্বল শিশুর অক্ষম গতিতে চলমান সেই সময় বিদ্যাসাগর আশীর্বাদের মতো আবির্ভূত হলেন। করুণার রসঘন সমাজ সংস্কারক একজন শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর, তাঁর সৃষ্টি সুষমায় বাংলা গদ্য সাহিত্যকে যথার্থ সাহিত্যিকগদ্য সাহিত্যে রসসঞ্চার করেছিলেন।

রাজা রামমোহন বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্য একটি ইতিহাসের দলিল। তাঁদের বক্তব্য প্রয়োজন ভিত্তিক। শৈল্পিক স্পন্দনে সমৃদ্ধ নয়। সাহিত্য এবং তারভাষা যে শুধু প্রয়োজনের কথা নয়, জীবিকার ভাষা নয়, এই বোধের সঞ্চার হতে আমাদের বিদ্যাসাগর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। গদ্যের এই আটপৌরে ছাঁচের মধ্যে একটি নিবিড় অন্তরঙ্গতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সাংকেতিক ভাষার প্রয়োজন হয় — যা লৌকিক হয়েও অলৌকিক, যা ব্যক্তির হয়েও বিশ্বের। বিদ্যাসাগরের রচনায় তার প্রথম আভাস আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বিদ্যাসাগরই একমাত্র বাংলা ভাষাকে সুশৃঙ্খল, সুসংযত, সুসংহত সৈন্যবাহিনীর মতো বিন্যস্ত করে দিয়েছিলেন। এদিক থেকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বসূরী। তৎকালীন সমাজে পচনশীলতা, কুসংস্কার, অশিক্ষার অন্ধকার মানুষগুলিকে বিশেষ করে নারী সমাজকে যেভাবে পীড়িত, লাঞ্ছিত ও অবমানিত করেছে, তার বিরুদ্ধে করুণাসাগর বিদ্যাসাগর প্রথম বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। তিনি মসিকে অসি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সেই কারণে তাঁর প্রায় সব রচনায় উদ্দেশ্য মূলকতা ছিল। তাঁর অজস্র কর্মযজ্ঞের অন্যতম একটি হলো বাংলা গদ্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা — যা তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ের মূর্ত প্রকাশ বলে পরিগণিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের সৃজনশীল সাহিত্য সম্ভারকে বা সমগ্র রচনাসম্ভারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে —

Scanned with CamScanner

* 'বাসুদেব চরিত' - ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে

(ক) অনুবাদমূলক রচনা :-

(i) বেতাল পঞ্চবিংশতি — ১৮৪৭ খ্রিঃ (হিন্দি বৈতাল পচ্চিসী)
(ii) শকুন্তলা — ১৮৫৪ ,, (কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম)
(iii) সীতার বনবাস — ১৮৬০ ,, (বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড ও ভবভূতির উত্তররামচরিত)
(iv) ভ্রান্তিবিলাস — ১৮৬৯ ,, (Shakespeare Comedy of Errors)
(v) বাঙ্গালার ইতিহাস — ১৮৪৮ ,, (outlines of the History of Bengal, compiled for use of youth in India)
(vi) জীবনচরিত — ১৮৪৯ ,, (চেম্বার্সের Biography)
(vii) বোধোদয় — ১৮৫১ ,, Rudiment of Knowledge
(viii) কথামালা — ১৮৫৬ ,, (ঈশপের ফেবলস)

(খ) মৌলিক রচনা :-

(i) সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব — ১৮৫৩
(ii) প্রভাবতী সম্ভাষণ — ১৮৯২ (রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বছরের মেয়ে প্রভাবতীর প্রসঙ্গে
(iii) বিদ্যাসাগর চরিত — ১৮৯১

(গ) সমাজ সংস্কারমূলক রচনা :-

(i) 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' — ১৮৫৫
(ii) 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' — প্রথম খণ্ড - ১৮৭১, দ্বিতীয় - ১৮৭৩

(ঘ) শিক্ষামূলক রচনা :-

(i) বর্ণপরিচয় — প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ - ১৮৫৫
(ii) সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা —

(ঙ) লঘু রচনা :-

(i) অতি অল্প হইল — ১৮৭৩ } (কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য)
(ii) আবার অতি অল্প হইল — ১৮৭৩ }
(iii) ব্রজবিলাস — ১৮৮৪ → [illegible]
(iv) রত্নপরীক্ষা — ১৮৮৬ → (কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য সহচরস্য)
(v) বিধবা বিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা বা বিনয় পত্রিকা — ১৮৮৪ → কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ

Scanned with CamScanner

বিদ্যাসাগর তাঁর গদ্য রচনার আদর্শ তিনি গ্রহণ করে-
ছিলেন ইংরেজি গদ্যের আদর্শ অনুসারে। ম্যাথু আর্নল্ডের
গদ্যরীতির আদর্শের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গদ্য রীতির সাদৃশ্য
লক্ষ করা যায়। স্বচ্ছতা, ভারসাম্য, যথার্থ, শৃঙ্খলা গদ্যের
আবশ্যিক - এই বিশ্বাসের দ্বারা বিদ্যাসাগর চালিত হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর বাংলা সাধু গদ্যের প্রথম সচেতন শিল্পী।
তিনি বাংলা সাধু গদ্যের কাঠামো কি হওয়া উচিত তা নিয়ে
পরীক্ষা চালান এবং চলিত গদ্যের সম্ভাবনা নিয়েও পরীক্ষা
করেন। বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন, গদ্যচর্চা সাধনার বস্তু, শব্দনির্বাচন
সতর্ক শিল্পসচেতন নির্ভর। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে দিয়েছেন
স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্য। তিনি বাংলা গদ্যের একটি রাজপথ
তৈরি করে দিয়েছিলেন, সে পথে পরবর্তী কালে বহুতর পদাতিকের
আগমন হয়েছে। এটাই বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি। রবীন্দ্রনাথের
কথায় - "বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা।"

তাহলেও বলা যায়, বিদ্যাসাগরী গদ্য ত্রুটিহীন নয়। বিদ্যাসাগরী
গদ্যরীতিকে বলা যায় সৈনিক বা রাজেন্দ্রাণী। বিদ্যাসাগরী ভাষা
অশ্ববেগে অনুকূল হয়ে কখনো হোঁচট খায় না। প্রস্তর মসৃণ রাজপথ
দিয়ে ব্যূহবদ্ধ সৈনিক শ্রেণির মতো তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে
যায়। আবার তা রাজেন্দ্রাণীর মতো সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত। দিনানুদিন
জীবনে নানা কাজে তাকে ব্যবহার করা যায় না, কারণ তা অন্তঃপুরবাসিনী
নয়। বিদ্যাসাগরের গদ্যে [illegible] উপাদান বাংলা ভাষা-
প্রকৃতির অনুকূল সংস্কৃত শব্দ, তার বাক্য গঠনরীতি অনেকাংশ
শতকের ইংরেজি গদ্যের অনুসারী। দুয়ে মিলে বিদ্যাসাগরী
গদ্যরীতি বাংলা গদ্যকে দিয়েছে সৌন্দর্য ও কল্পনাভঙ্গিমা,
বিবরণাত্মক বস্তুনিষ্ঠতা ও সারবত্তা, ধ্বনিহিল্লোল ও ছন্দস্পন্দ। বাংলা
গদ্যের পরবর্তী ঐশ্বর্যের ভিত্তিভূমি এই বিদ্যাসাগরী গদ্য।

Scanned with CamScanner

□ বাংলা গদ্যরীতিতে বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য :-

(এক) বিদ্যাসাগরের হাতে সাহিত্যিক গদ্যের জন্ম।

(দুই) তিনি গদ্যরীতির ভারসাম্য রক্ষা করতে মধ্যপন্থা অনুসরণ করেছিলেন।

(তিন) ইংরেজি Sentence Structure বা বাক্যগঠনরীতি বিদ্যাসাগরের রচনায় প্রথম চোখে পড়ে।

(চার) বিদ্যাসাগরের গদ্য চিত্রকল্পময়। যেমন-

"শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে' এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন",

(পাঁচ) বাংলা গদ্যভাষাকে তর্কবিতর্কের ভারবহনক্ষম যেমন করেছিলেন তেমনি সরস অনুবাদের জন্য যে ভাষার প্রয়োজন সেই ভাষাও ব্যবহার করেছেন।

(ছয়) ভাষার মধ্যে অনাতিলক্ষ্য ছন্দচেতনা এনেছেন। গদ্যে সুর, তাল, লয়, যতি ইত্যাদির প্রয়োগ কৌশলতায় গদ্যের মধ্যে প্রবহমানতা এনেছেন - যা মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল না। যেমন

"প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গের মতো।"

(সাত) সংযুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার তাঁর গদ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। যেমন- গমন করিলেন, শ্রবণ করিলেন।

(আট) বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্য আতিশয্যহীন, বিশেষ কোনো শব্দের প্রবণতাহীন।

(নয়) বাক্যপুঞ্জকে বিরতি ও যতিচিহ্ন দ্বারা শাসিত ও সংশোধিত করে বাংলা গদ্যকে রসপর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

Scanned with CamScanner

(দশ) বিদ্যাসাগর প্রথম যথার্থ কমা, সেমিকোলনের ব্যবহার করেন।

(এগার) বিদ্যাসাগরী গদ্যে বঙ্কিমের সুরগত পদধ্বনি লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো জায়গায় তার আশ্চর্য নিরাভরণ। যেমন –

"বলি টাকা কোথায়? সে বলিল, আর টাকা কোথায় পাইব? আমার নিকটে যাহা ছিল তাহা দিয়া এই দড়ি কিনিয়া আনিয়াছি।"

(বারো) বিদ্যাসাগর শুদ্ধ সাধু গদ্যরীতির গদ্য রচনা করলেও কথ্য বাংলার প্রাণধর্মকে তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন।

অবশেষে বলা যায় বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রচলিত ফোর্ট উইলিয়াম পাঠ্যপুস্তকের বিভাষা, রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত-ভাষা এবং সমসাময়িক সংবাদ পত্রের অপভাষা কোনোটাই একান্তভাবে গ্রহণ না করে যথাযথ গ্রহণ-বর্জন করে সাহিত্যের ও সংসারের সব রকম প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায় –

"বিদ্যাসাগর গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুশৃঙ্খল, সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংহত করিয়া তাহাকে সহজ গতি ও কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।"

— ০ —

দূরভাষ :- 8640932050
8013024743

2012, 2014

Q: বাংলা গদ্যসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো।

□ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে যিনি নতুন করে মেজাজ ও ভঙ্গির প্রাধান্য দিয়ে গড়ে তোলার প্রয়াস করেছিলেন তিনি হলেন 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পত্রিকার সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। তিনিই প্রথম বাংলা প্রবন্ধের মধ্যে মজলিশি আলাপের সুর, খেয়াল-খেলার লীলায়িত ছন্দ, ভারমুক্ত স্বচ্ছন্দ মননের 'বিদ্যুদ্দীপ্তি' সঞ্চরণের প্রবর্তন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে মাঝে মাঝে হালকা চাল থাকলেও তাঁর আলোচনা গাম্ভীর্যপ্রধান ও গভীর সুরে অনুরণিত। হাস্য-কৌতুক ও রঙ্গ-ব্যঙ্গের ছদ্মবেশের অন্তরালে তাঁর গভীর হৃদয়াবেগ, নৈতিক আকুতি মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কোথাও কোথাও গীতিকবিতার গদ্যরূপ, নিবিড় ভাবাবেগ ও কল্পসৌন্দর্যের সমাবেশ একান্তভাবে কাব্যধর্মী, কোথাও বা বুদ্ধির যুক্তি প্রয়োগে শাণিত অস্ত্রের মতো দীপ্ত। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের মধ্যে আমরা যে তীক্ষ্ণযুক্তি, লঘু কল্পনা ও স্বচ্ছন্দচারী 'খেয়াল'-এর পরিমণ্ডল যা একান্ত তাঁর নিজেরই।

□ প্রমথ চৌধুরী স্বভাবে ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, মননাশ্রয়ী এবং প্রগতিবাদী। তাঁর চিন্তা ও মননশীলতা, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়োজিত ছিল বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালি মানসের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিসাধনে। তিনি ছিলেন বিংশ-শতাব্দীর নাগরিকতার ভাষ্যকার — 'বাঙালি জাতির বিদূষক'। 'বীরবল' ছদ্মনামের আড়ালে তাঁর সাহিত্য পরিচিত ছিল

← 'বীরবলী সাহিত্য' বা, 'বীরবলী স্টাইল' নামে। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' গ্রন্থে প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে বলেছেন –

"সব্যসাচী প্রমথ চৌধুরী, 'সবুজ পত্র' তাঁর গাণ্ডীব। ... তার সবুজ অন্তর সবুজের পাশুপত শেনার ফলা। ... রুচির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বররুচি রূপের চাইতেও বরপুত্র, জ্ঞানের পথে তাঁকে বলা যায় বরযাত্রী। রূপের চেয়ে রুচি, রুচির চেয়ে বুদ্ধিকে বড়ো মনে করতেন তিনিই। তাঁর সাহিত্য প্রাতভার নাগ্নতা ছিল – ছিল অনন্যতা।"

□ প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো –

১/ তেল-নুন-লকড়ি (১৯০৬)
২/ বীরবলের হালখাতা (১৯১৭)
৩/ নানা কথা (১৯১৯)
৪/ আমাদের শিক্ষা (১৯২০)
৫/ দু-ইয়ারকি (১৯২১)
৬/ বীরবলের টিপ্পনী (১৯২১)
৭/ রায়তের কথা (১৯২৬)
৮/ নানাচর্চা (১৯৩২)
৯/ ঘরে-বাইরে (১৯৩৬)
১০/ প্রাচীন হিন্দুস্থান (১৯৪০)

১১/ বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (১৯৪৪)
১২/ আত্মকথা (১৯৪৬)
১৩/ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান (১৯৫৩)

☐ প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ পদক্ষেপে বহু প্রান্ত বিচরণভূমি তিনি অনায়াসে অতিক্রম করে গেছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি সমকালীন যাবতীয় সমস্যাকীর্ণ বিষয়ের উপরই দৃষ্টিপাত করেছেন। ভাষা, সাহিত্য, সমালোচনা, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করেই তিনি তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করেছেন। 'কথার কথা', 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা', 'বাংলা ব্যাকরণ', 'আমাদের ভাষা-সঙ্কট' প্রভৃতি প্রবন্ধে ভাষা সমস্যার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। মনোভাব প্রকাশের পক্ষে তিনি চলিত ভাষাকে স্বাভাবিক এবং সর্বাধিক উপযোগী ভাষা বলে মনে করেছেন। তাই 'বীরবলের হালখাতা' গ্রন্থের 'কথার কথা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন —

"ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।"

এছাড়া 'সাহিত্যে খেলা', 'সাহিত্যে চাবুক', 'কাব্যে অশ্লীলতা', 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি সাহিত্য তত্ত্বের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্য নির্দিষ্টভাবে আনন্দদান, কোনো ব্যক্তিবিশেষের মনোরঞ্জন নয় বরং সাহিত্য

উদ্দেশ্য মূলক নয়।

□ প্রমথ চৌধুরী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমস্যা মূলক প্রবন্ধ গুলিতে আমরা সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় পাই। অজ্ঞতা ও যুক্তিহীনতা যে মানুষের উন্নতির অন্তরায় সে বিষয়ে তিনি মত প্রকাশ করেছেন তাঁর 'তেল-নুন-লকড়ি' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি কামনা করেছিলেন মনুষ্যত্বের স্ফুরণ। তিনি ছিলেন ঐতিহ্যের অনুসারী, তাঁর স্বদেশ প্রীতি যুক্তি বিযুক্ত নয়। ফলে পল্লীজীবনের অভাব-অভিযোগ দূর করার আন্দোলনের সময় পল্লী সংগঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন দেশের উন্নতির জন্য স্বদেশীর সাথে আরও সাধারণ মানুষের চেতনার প্রয়োজন। তাই তিনি 'বয়কট' ও 'স্বদেশীতা' প্রবন্ধে বলেছেন —

"আমাদের কোটি কোটি [illegible] সাধারণের পক্ষে দেশের কথা প্রথমত পেটের কথা। তাদের মুখের কথা নিবৃত্তির উপায় যদি না করে দিতে পারি তাহলে আমাদের মুখে মধুর বোল। আর পেটের জ্বালায় জ্বলছে. তাদের উপরন্তু কথার জ্বালায় জ্বালাবার কোনো দরকার নেই।"

□ প্রমথ চৌধুরীর মননের মধ্যে ছিল ফরাসী মেজাজ এবং মন ছিল ভারতীয় রসবোধে সঞ্জীবিত। সবার উপরে ছিল তাঁর উচ্চাঙ্গের ইনটেলেকট্ বা দীপ্তি। তাঁর মধ্যে ছিল ক্লাসিক প্রীতির সঙ্গে নির্মোহ আধুনিকতা, বহুশ্রুত ভাবের সঙ্গে ভাষার চমক। তাই তাঁর গদ্যকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ইস্পাতের ছুরি।' এই সূত্রে প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের বৈশিষ্ট্য গুলিতে তাঁর ক্ষিপ্র

সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে :—

১/ আলঙ্কারিকতা ও উপমা প্রয়োগের অভিনবত্ব।

২/ আত্মকথনের দুর্বলতা থেকে প্রবন্ধের মুক্তি।

৩/ স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা।

৪/ যুক্তিনির্ভর, আবেগশীলতা, তীব্র ব্যক্তিত্ব ও নাটকীয়তা তাঁর প্রবন্ধে দিয়েছে স্বতন্ত্র মর্যাদা। যেমন:

"বই পড়ার শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসাবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাইনে।"

৫/ ব্যঙ্গধর্মী বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা।

৬/ তিনি আত্মশিক্ষা বলতে স্ব-শক্তির প্রসঙ্গ থেকে মানুষের মনের মুক্তিকে বুঝিয়েছেন।

৭/ গদ্যের মধ্যে তিনি মানুষের মুখের কথাকে সাহিত্যের ভাষার মর্যাদা দান করেন।

৮/ তাঁর গদ্যরীতির সংক্ষিপ্ততা ও শাণিত বাগ্‌ভঙ্গি পাঠককে আকর্ষণ করে, মাতে, বলে ফরাসী সাহিত্যের। যেমন:

(i) মন্ত্র সাপকে মুগ্ধ করতে পারে কিনা জানিনে, কিন্তু মানুষকে যে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো আমরা ভারতবর্ষ। (সবুজ পত্রের মুখপত্র)

(ii) পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কিছু কম মূল্যবান পদার্থ নয়। (বই পড়া)

Scanned with CamScanner

(গ) "দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মনঃশক্তির খেলার ফল।" (বই পড়া)

অবশেষে বলা যায় প্রমথ চৌধুরীর গদ্যে যে ঋজু ভাষাগত বক্তব্যভঙ্গি, উইট ও ব্যঙ্গাত্মক নির্মমধর্ম বাংলার গদ্যে তিনি প্রথম আমদানি করেন এবং বাঙালির মনন ও সাংস্কৃতিকে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার থেকে মুক্তিদান করে। প্রমথ চৌধুরী চলিত গদ্যরীতির বাংলার গদ্যের যে নতুন সম্ভাবনা দিয়েছেন এবং প্রবন্ধে আঙ্গিকের যে পরিবর্তন এনেছেন সেজন্য প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

— ০ —